আরিফ হত্যার অন্তরালে

ওবায়দুল হক সরকার

গত সপ্তাহে এই দৈনিকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ টেলিভিশন ও কিছু কথা'র কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা শুনলাম। কেউ কেউ বললেন, "আমাদের সমাজে মদ্যপান, মারিজুয়ানা এসব নেই, অস্বীকার করতে পারেন? যদি থাকে তাহলে দেখতে হবে না?" আমি বললাম, "আমাদের দেহের ভিতরে কি মল-মূত্র নেই, তাই বলে কি তা প্রমাণের জন্য গায়ে মেখে বেড়াতে হবে।" সমাজ দেহের ভিতরে সৃষ্টির আদি থেকে পচা-গলা বহু কিছু ছিল, আছে এবং থাকবে সেগুলো মূলোচ্ছেদে কদর্য ব্যবস্থা নিলে হিতে বিপরীত হবে। নাটক হলো সুস্থ ও সুন্দর মূল্যবোধ প্রচারের কেন্দ্রস্থল। সেখানে অসুন্দরের স্থান নেই।

সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা বিপরীতধর্মী হয়ে আজ আমাদের ধর্মকে পর্যন্ত আঘাত হানার চেষ্টা করছে। এই অপসংস্কৃতির সংহারে আরিফের মত একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ছাত্রের অনাঘাত মৃত্যুবরণ করতে হলো। ক্ষণস্থায়ী না হলে সে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসাবে বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারতো। একটি মাত্র বুলেট আরিফের আত্মীয়-স্বজন, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ করে দিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বই-এর পাঠ চুকে গিয়ে বুলেটের পাঠ শুরু হওয়ায় বহু আরিফ পূর্বে গত হয়েছে আগামীতেও হবে। উর্বরা ভূমিতে গাছ ও আগাছা, উভয়ের ফলনই অত্যধিক। নিড়ানী দিয়ে আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়, নয়ত ফসল ঘরে তোলা যায় না। প্রকৃতির লিলানিকেতন এই বাংলাদেশে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিকল্পের হার বিশ্বে বিস্ময়। সংস্কৃতির সুফল মানব, আর অপসংস্কৃতির অবদান দানব। কোন একটি দানব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাক্তা নাম্যজী, অত্যন্ত নিরীহ ও আশ্চর্য মেধাবী (কোন পরীক্ষায় ২য় হয়নি) এই ছাত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী হলেও, মূল কারণ অপসংস্কৃতির আধিপত্য।

শ্বাপদ সংকুল বনের সংস্কার সাধন করে বাগানে রসভারী করে ফুলে ফলে সুশোভিত করলে তার মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্য হলো মানব মনের বনের সংস্কার সাধন করে তাকে বাগানে পরিণত করা— তার সুকুমার চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তার জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তোলা। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন হলো সংস্কৃতি চর্চার একমাত্র লক্ষ্য— চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে চিত্ত আলোকিত করা— দানবরূপী মানবকেও প্রকৃত মানব করা। বৃক্ষ তখনই ফলদায়ক হয়, যখন মাটি থেকে তার মূল প্রচুর পরিমাণে রস আহরণ করতে পারে আর তার ডাল পাতা খোলা আলো-বাতাস থেকে পরিমিত খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করতে পারে। দেশের মাটি থেকে উৎসারিত সংস্কৃতিকে দেশবাসীর সাথে নিবিড় সংযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তবেই হয় জাতীয় সংস্কৃতি। দেশের সহজাত সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ না হলে তা জাতীয় সংস্কৃতির রূপ নিতে পারে না। আরোপিত বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চার দরুন অপসংস্কৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলে জাতীয় সংস্কৃতিকে, শুরু হয় মানবিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়।

১৯৫০ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হয়ে ভর্তি হলাম। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত ছিলাম। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম তৎকালীন সরকার কর্তৃক সেজন্য নিগৃহীত হয়েছিলাম। ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তখনকার সংস্কৃতির অবদান চিরস্মরণীয়।

প্রথমদিকে রোজা রেখে দোয়া-দরূদ পড়ে শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করতাম, পরে কেমন যেন হয়ে গেল। সবাই ভুলে গেল দেশবাসীর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। শোক প্রকাশে এদেশের স্থানীয় মুসলমানদের নিজস্ব রীতি-নীতি আছে। দেখা গেল বিশেষ ধরনে শোক প্রকাশ না করলে তা প্রকৃত (প্রগতিবাদী) শোক প্রকাশ হয় না। স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে গেলে তা হয় 'সাম্প্রদায়িকতা'।

আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে কিন্তু বড় হয়েছি পশ্চিমবঙ্গে। অবিভক্ত বাংলার অবিভাজ্য সংস্কৃতির স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাই স্বীয় সত্তা বজায় রাখার জিদ আমার বরাবর (১৯৬৬ সালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বিভিন্ন লেখা তার প্রমাণ)।

বাংলাদেশের প্রথম ছাত্র-ছাত্রী মিলিত নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলাম আমি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সহ-অভিনয় চালুর মূলেও আমি (১৯৫১ সাল থেকে সব পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত তথ্যাদি আমার কাছে রয়েছে) তখন সংস্কৃতি চর্চার চেষ্টাই করেছি, অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হইনি, কাউকে হতে দেইনি।

সংস্কৃতি শুধু নয় শিক্ষাঙ্গনে পর্যন্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখায় ব্রতী হয়েছিলাম জাতির শতকরা ৯০ জন মুসলমান। অতএব ইসলামী প্রতীকধারী হয়েছিলো আমাদের সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম। নীচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের মনোগ্রাম তুলে ধরা হলো।

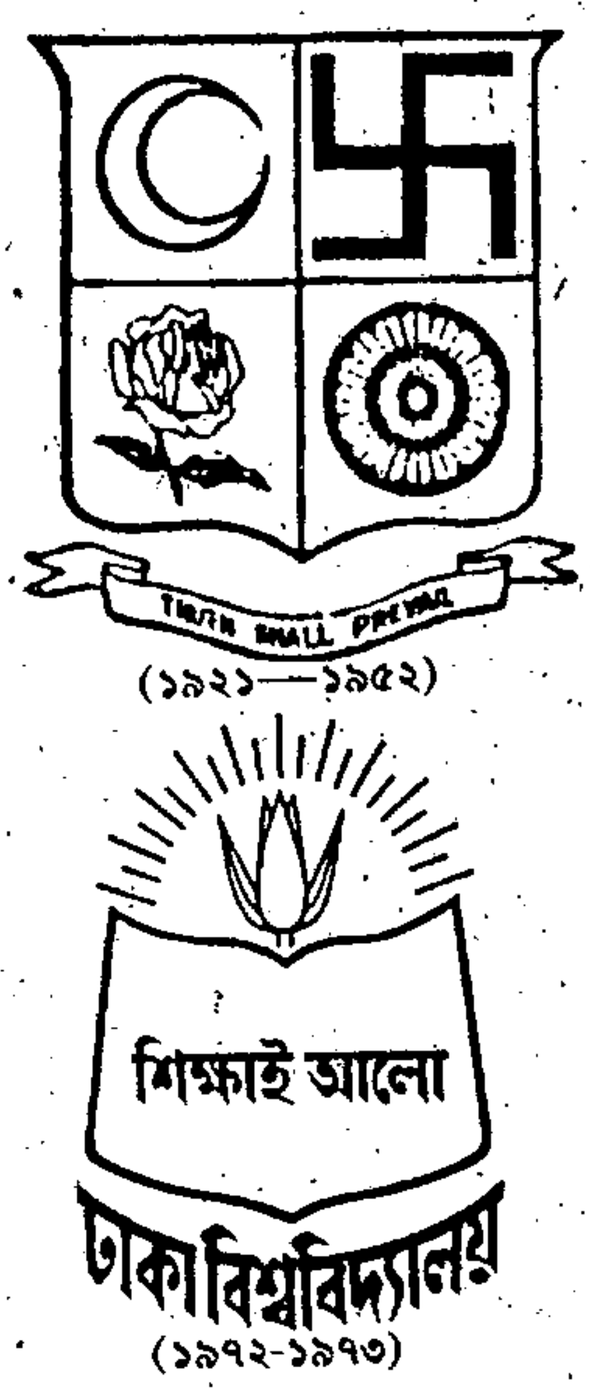

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে এতদঞ্চলের মুসলমানদের জীবন আবার 'মানবেতর' পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুমিত সরকারের "দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল" গ্রন্থের ৪১২ পৃষ্ঠায় দাবী করা হয়েছে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান কৃষক ছিল হিন্দু জমিদারদের "লাইভস্টক (গৃহপালিত পশু)।" বঙ্গভঙ্গের ফলে পশুরা মানুষ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো, তাই তা রদ করা হয়েছিলো। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই ফাঁকে, এই কয় বছরের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পেয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন তাদের শক্ত করার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু তৈরী কারখানা হওয়ায় মুসলমানদের জন্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২১ সালে এই মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কিন্তু মুসলমানদের ঐতিহ্যধারী কোন প্রতীক ঠাঁই পায়নি। বৃটিশ রাজ অবসানের পর ১৯৫২ সালে সেই মনোগ্রামেই মুসলমানের মান বজায় রাখার চেষ্টা করা হলো।

শিবের ললাটের শশীর স্থানে এলো মুসলমানদের চাঁদ তারা হিন্দু পূজার স্মারক স্বস্তিকার (জার্মান মৃস্তিকা কাত করা) মূলে কোরআন পাক, অশোক চক্রের নৌকা। কিন্তু ১৯৭২ সালে মনোগ্রাম থেকে মুসলমানী সবকিছু মুছে ফেলা হলো এমন কি কোরআন পাক পর্যন্ত।

শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে কোরআন পাকের প্রতীক মুছে ফেলা— শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। ১৯৭৪ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের ব্যানার হেডলাইন ছিল সূর্যসেন হলের হত্যাকাণ্ড। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল কয়েকটি ছবিসহ নিম্নোক্ত সংবাদঃ

"বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

"......সূর্যসেন হলের প্রতিটি কক্ষে.... সবশেষে উপর্যুপরি 'ব্রাশ ফায়ারে' সাতটি তরুণের বাঁচিয়ে থাকার আকুল আগ্রহকে শুষিয়া লইয়া বিনা বাধায় প্রস্থান করিয়াছে। ফেলিয়া গিয়াছে রক্তাক্ত মেঝেতে সাতটি প্রাণহীন তরুণের দেহ আর অসংখ্য প্রশ্ন।....."

বই ছেড়ে বুলেট ধরলো ছাত্ররা। শুরু হলো বিদ্যাপাঠ ছেড়ে মনুষ্য বধের পাঠ গ্রহণ। শিক্ষা সর্বোচ্চ পাদপীঠে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হতে লাগল। বই (কেতাব মানে কোরআন পাক)-এর স্থান দখল করলো বুলেট— বরকতের বদলে বিড়ম্বনা দেখা দিল। আমার শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়েছিলো চার বছরে, আর আমার মেয়ের শিক্ষাবর্ষ শেষ হলো সাত বছরে। তবু আল্লাহর কাছে হাজার শোকর মেয়েটি সশরীরে এসেছে, আরিফের মত লাশ হয়ে আসেনি।

'মেন সুইচ' অফ করে সাইড সুইচ হাজার টেপাটেপি করলেও বাতি জ্বলে না। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল হলো কোরআন পাক, তাকে অস্বীকার করে যদি নতুন কিছু করতে যাই তাহলে তা যতই 'প্রগতি'র পরিচায়ক হোক না কেন, পরিণামে দুর্গতি ডেকে আনবে।

১৯৫০ সালে ঢাকায় সংস্কৃতি চর্চা ছিল না বললেই চলে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগে জীবন ছিল কত সুন্দর, কত নিশ্চিত, কত নিরাপদ, ১৯৯০-এর প্রারম্ভে জীবন কত অনিশ্চিত কত আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আরোপিত বিজাতীয় অপসংস্কৃতির দাসত্বের কারণে পরিবেশ এমন দূষণীয় হয়ে উঠেছে। সব কিছুর উৎস মন। সেই মন সাফ করার জন্য সংস্কৃতি— একথা সংস্কৃতি সেবীরা যেন ভুলে না যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সীল ও মনোগ্রাম

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল ও মনোগ্রামের বিবর্তন। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতিসত্তার কোন অবস্থার বিবর্তনকে সনাক্ত করে?